wPšv I K‡g ev¯eZvi Abkxjb

[evsjv]

حول الواقعية في الفكر والعمل

[اللغة البنغالية]

mvbvDjøvn web bwRi Avng`

ثناء الله بن نذير أحمد

m¤úv`bv : Avjx nvmvb ˆZqe

مراجعة : علي حسن طيب

Bmjvgx cÖPvi e¨‡iv, ivebqvn, wiqv`

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

2008 -1429

wPšv I K‡g ev¯eZvi Abkxjb

আলোচনার শুরুতে 'বাস্তবতা' অভিধার মর্ম উদ্ঘাটন আবশ্যক বলে মনে করি। কারণ, কিছু পরিভাষা রয়েছে যার বিপরীতমুখী অনেক অর্থ বিদ্যমান। কিছু মানুষ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থ প্রয়োগ করে থাকে। যেমন, কোনো ইসলামি লেখক যদি বলে, 'ইসলাম বাস্তবতার ধর্ম' এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য, ইসলাম মানুষের স্বভাবের ধর্ম এবং তার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পার্থিব জগতের সকল ক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে মানব জাতিকে ভারসাম্যপূর্ণ ও উত্তম পন্থায় পরিচালনাকারী একমাত্র ধর্ম ইসলাম। কারো কারো নিকট বাস্তবতার অনুবর্তনের অর্থ চিন্তা ও আচরণের সমকালীন ধারা মেনে নেয়া এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকা, হোক না তা গ্রহণযোগ্য কিংবা পরিত্যাজ্য। অথবা পরস্পরের মাঝে অর্ধার্ধি সমঝোতা বা আদর্শ থেকে পিছু হটার নামই হচ্ছে বাস্তবতা। মূলত তারা নিজ দুর্বলতা ও অক্ষমতার বৈধতা দেয়ার জন্যই বাস্তবতার এ সংজ্ঞা পেশ করে। তারা অহর্নিশ বলে বেড়ায়, 'আমাদের বাস্তবধর্মী হওয়া একান্ত প্রয়োজন' যার অর্থ তুচ্ছ ও সামান্যে তুষ্ট থাকা।

বস্তুত এ হচ্ছে ওই সব লোকের বাস্তবতা, যাদের ব্যাপারে কোরআনুল করিমে এরশাদ হয়েছে : "এবং তারা বলল, 'তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না'।"[১] অথবা এটা সে সব লোকের বাস্তবতা, যারা কোরআনের আয়াত– "তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না"[২]– এর মনগড়া ব্যাখ্যা করে। বর্তমান সময়ে কিছু ইসলামি দল বা মুসলিম রাষ্ট্র অন্য দল বা রাষ্ট্রের সঙ্গে বাস্তবতার দোহাই দিয়ে যেসব চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে এবং যে ধরনের বশ্যতা মেনে নিচ্ছে, তা বাস্তবতার ভুল ব্যাখ্যার ফলেই সম্ভব হয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় তা নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'চিন্তা প্রসূত কাল্পনিক নকশার সামনে অবনত মস্তক না হওয়া। বা এমন কোন পরিকল্পনার জন্য জেদ না ধরা, যা বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব কিংবা খুব কঠিন।' যদিও তা বাস্তবতার নিরিখে সঠিক বলে বিবেচিত হয়। তার কারণ, আমাদের চারপাশের পরিবেশ। এ পরিবেশ আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সামান্য সহযোগিতা করবে না। আরেকটি কারণ, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও উপায়-উপকরণ সীমিত, রয়েছে লোকবলের অভাব। তাই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যের কাছাকাছি বিষয় বস্তু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি। আর শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আরো পরিপূর্ণ ও উত্তম বস্তুর জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখি। যারা দিবাস্বপ্নে মোহগ্রস্ত, যারা ঐতিহাসিক বিরোধগুলো বারবার চর্চা করে, যারা তথাকথিত বাস্তবতা ও আধুনিকতার রক্ষক ও ধ্বজাধারী, আমরা তাদের সামনে নত হব না, মেনে নিব না কখনো তাদের বশ্যতা।

ইমাম যাহাবী রহ. 'খোলাফায়ে রাশেদিনের গুণাবলি বিশিষ্ট শাসকের প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে এ বিষয়ের ওপর একটি সুন্দর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বর্তমান যুগে এমন একজন ইমাম প্রায় অসম্ভব, যিনি সর্ব ক্ষেত্রে ও সব বিষয়ে সঠিক পথে পরিচালিত হবেন। আল্লাহ যদি এ জাতির জন্য এমন একজন ইমামের ব্যবস্থা করে দেন, যার মধ্যে অনেক ভালো দিক থাকবে এবং সামান্য খারাপ দিকও থাকবে, সে-ই এ জাতির জন্য যোগ্য ইমাম, তার চেয়ে যোগ্য ইমাম আমাদের জন্য আর কে হবে?!"

এ বাক্যের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত বাস্তবতা মেনে নেয়ার একটি সুন্দর উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি এমন একজন ইমামের প্রত্যাশা করেছেন, যার মধ্যে খারাপও থাকবে, তবে কম। তিনি এ কথা বলেননি, 'ইমামকে খোলাফায়ে রাশেদিনের মতই হতে হবে।' আবার এ কথাও বলেননি যে, 'আমরা এমন ইমাম কামনা করি না, যার মধ্যে খারাপের কোন অংশ থাকবে।' তিনি ছিলেন সত্যিকারার্থে বাস্তব-দ্রষ্টা, সময়ের চাক্ষুষ সাক্ষী, পরিবেশের ওপর গভীর দৃষ্টি প্রদানকারী ও অতীত ইতিহাস সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি।

GKwU HwZnvwmK `óvš

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রথম খুতবায় বলেছিলেন, "জেনে রাখ! আমি এমন কিছু কাজ সম্পাদন করি, যার ওপর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে না। যা

[১] আত্-তাওবা : ৮১

[২] আল-বাকারা : ১৯৫

করতে করতে বৃদ্ধরা শেষ হয়ে গেছে, বাচ্চারা বার্ধক্যে পৌঁছেছে। তারা সবাই একে দীন মনে করেছে, অন্য কিছু মনে করেনি।" একদা ছেলে আব্দুল মালেক তাকে বলল, "হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি আল্লাহর কিতাব এবং তার নবির সুন্নত বাস্তবায়ন করুন। এ কারণে যদি আপনাকে-আমাকে তেলের কড়াইতে ভাজাও হয় তাতে পরওয়া কীসের?! তিনি উত্তর দিলেন, "উটকে পোষ মানানোর ন্যায় আমি মানুষদের আস্তে আস্তে পোষ মানাতে চেষ্টা চালাচ্ছি। সুন্নতের একটি দরজা উন্মুক্ত করলে, লোভেরও একটি দরজা উন্মুক্ত করি। ফলে, তারা সুন্নত থেকে পলায়ন করতে চাইলে, লোভের আকর্ষণে ঠাঁই দাঁড়াবে। আমি যদি তাদেরকে পঞ্চাশ বছর তরবিয়ত করি, তবুও আমার ধারণা, আমি তাদের দ্বারা যা ইচ্ছে তা বাস্তবায়ন করাতে পরব না।"[৩] ইমাম শাতেবীর 'মোয়াফাকাত' গ্রন্থে কথাটি এভাবে আছে, "আমার আশঙ্কা, আমি যদি মানুষের ওপর হকের দণ্ড এক সাথে রেখে দেই, তবে তারা এক সাথে সব প্রত্যাখ্যান করবে, তখন এ ফিতনার কারণ কে হবে?"[৪]

খলিফা আব্দুল আজিজ রহ. হিজরির প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার কঠিন বাস্তবতা চরমভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি 'ধীরে কর' নীতি গ্রহণ করেন। বর্তমান যুগের বিজ্ঞজনেরা যেমন বলে থাকেন। তিনি এক সময় মানুষের সামনে সুমিষ্ট লোভনীয় বস্তু পেশ করেন, অন্য সময় তিক্ত সত্যকে মেনে নিতে বাধ্য করেন।

সালাউদ্দিন আইয়ূবী রহ. যখন ফাতেমী সাম্রাজ্য রহিত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন, তখন তিনি হঠাৎ করেই মিশরবাসীদের কাছে এ ঘোষণা দেননি। তিনি ছিলেন সে সময় মিশরের মন্ত্রী এবং নুরুদ্দিন মাহমুদের প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর সেনা প্রধান। তিনিও 'ধীরে চল' নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমে চার মাজহাবের আদর্শে বিশ্বাসী সুন্নি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হিজরি ৫৬৬ সনে একটি পরিত্যক্ত জেলখানায় শাফেয়ি মাজহাবের মতাদর্শের একটি মাদরাসার ভিত্তি রাখেন। এরপর ফাতেমীদের জারিকৃত আজানের মধ্যে অতিরিক্ত বাক্য ( ) রহিত করেন। অতপর খুতবার মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদিনের নাম উল্লেখ করার নির্দেশ জারি করেন। এক পর্যায়ে ফাতেমীদের খুতবা বাতিল ঘোষণা করেন। এ পরিকল্পনার জন্য তাকে সহযোগিতা করেছে তার মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা কাজী ফাজেল। সে ছিল মিশরের অধিবাসী এবং সরকারী ও দাফতরিক কাজে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

একদা আলী রা. খলিফা ওমর রা. কে দেখেন, তিনি জাকাত খাতে উশুলকৃত সরকারী উটগুলোর চিকিৎসা নিজ হাতে প্রদান করছেন। তিনি উটগুলোর চর্মরোগের চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। তাও ছিল গ্রীষ্মের কোন এক উত্তপ্ত দিনে। আলী রা. ওমরের শক্তি ও আমানতদারি দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। অতপর তিনি বলেন, "আপনার পরবর্তী খলিফাদের আপনি অক্ষম করে দিয়েছেন!" এটা একটা বাস্তব ঘটনা, যার প্রেক্ষিতে মানুষ বলাবলি করত : অমুক ব্যক্তি কেন ওমরের মত হয়নি? অমুক ব্যক্তি কেন ওমরের মত কর্ম সম্পাদন করে না? অসম্ভব! এমনটি আর কখনো বাস্তবতার মুখ দেখবে না। ওমর ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত, যার ব্যাপারে রাসূল সা. বলেছেন, "আমি ওমরের ন্যায় এমন বিচক্ষণ ব্যক্তি দেখিনি, যে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে নিখুঁতভাবে পৌঁছতে পারে।" তবে এর অর্থ এ নয় যে, আমরা বসে থাকব কিংবা এর চেয়ে উত্তম বস্তুর জন্য চেষ্টা করব না। বরং উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য সর্বদা চেষ্টা তদবির অব্যাহত রাখাই হবে বাস্তবতার দাবি।

ivm‡ji Av`k †_‡K

হাদিসে এসেছে রাসূল সা. বলেছেন, "আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে বারণ করি, তোমরা তা পরিত্যাগ কর। আর আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিসের ব্যাপারে নির্দেশ দেই, তোমরা তা সাধ্যানুসারে বাস্তবায়ন কর।"[৫]

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, "দীন সহজ। যে কেউ দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করবে, দীন তাকে কাবু করে ফেলবে। অতএব তোমরা সঠিক পন্থা অবলম্বন কর, তার কাছাকাছি থাক এবং এতেই তোমরা প্রসন্ন থাক ও তৃপ্তি বোধ কর। সকাল-সন্ধ্যা ও শেষ রাতে এবাদত করে আরো অগ্রসর হও।" অর্থাৎ ধারাবাহিক সামান্য আমল ও তার প্রতিদানের ওপর সন্তুষ্ট থাক এবং এবাদতের উত্তম

[৩] আল-মারওজি, আস্‌সুন্নাহ, পৃ : ২৬
[৪] শাতেবী, মোয়াফাকাত : ২/৯৩
[৫] বুখারি ও মুসলিম

সময় ও শরীরের প্রাণবন্তকর মুহূর্তগুলোতে সাধ্যানুসারে এবাদত সম্পাদন কর, যেমন সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের শেষ ভাগে। ইমাম নববি রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তোমরা উত্তম পন্থাটি অন্বেষণ কর এবং সে অনুসারে এবাদত কর। যদি তোমরা এর ওপর আমল করতে অক্ষম হও, তবে উত্তম পন্থার কাছাকাছি থাক।" ইমাম কাসতাল্লানি রহ. বলেন, "যদি তোমরা উত্তম আমল করতে অপারগ হও, তবে তার কাছাকাছি আমল কর।"[৬]

মুসনাদে আহমদে আব্দুল্লাহ ইবনে সাদি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "ওমর রা. আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার কাছে তোমার ব্যাপারে একটি সংবাদ পৌঁছেছে, সংবাদটি কি সত্য? তুমি জনগণের অনেক দায়িত্ব পালন কর, কিন্তু যখন তোমাকে তার পারিশ্রমিক দেয়া হয়, তুমি তা গ্রহণ কর না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী? বললাম, আমি বিত্তবান। আমার অনেক গোলাম ও ঘোড়া রয়েছে। আমি চাই, আমার খেদমতগুলো মুসলমানদের জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হোক। ওমর বললেন, এমনটি কর না। তুমি যেরূপ কর, আমিও সে-রূপ করতাম। রাসূল সা. আমাকে হাদিয়া তোহফা দিতেন, আমি বলতাম, আমার চেয়ে যে বেশি গরিব তাকে দান করুন। তখন রাসূল সা. বলেছেন, তুমি এটা গ্রহণ কর। এবার তোমার ইচ্ছে, তা বিনিয়োগ করে এর দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি করতে পার, আবার তা সাদকাও করতে পার। আল্লাহ তাআলা যে সব সম্পদ তোমাকে দান করেন, তোমার প্রার্থনা কিংবা আগ্রহ ছাড়াই, তা তুমি গ্রহণ কর। আর যা থেকে তিনি তোমাকে বিরত রাখেন, তার পিছনে তুমি নিজকে ব্যাপৃত কর না।"[৭]

এটা হচ্ছে ইসলামের আদর্শ, যা মানুষের স্বভাবের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। এটাই হচ্ছে মধ্যম পন্থা, এর মাধ্যমে মানুষের স্বভাবগত প্রয়োজন, আবেদন ও চাহিদার সুরক্ষা হয়। অর্থাৎ তুমি সম্পদ গ্রহণ কর, অতপর তা বিনিয়োগ কর বা সদকা করে দাও। কারণ, মানুষ দুনিয়ার জীবনে সম্পদের মুখাপেক্ষী, যদি সে সম্পদ ত্যাগ করে, এমন পরিস্থিতির শিকার হতে পারে, যেখানে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হবে, যা ইসলামের আদর্শের পরিপন্থী।

I jvgv‡`i wPšb evYx †_‡K

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, "যখন উত্তম বস্তু গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তখন তার চেয়ে কম উত্তম বস্তু গ্রহণ করা বৈধ। তিনি উদাহরণস্বরূপ কতক শাসকদের ব্যাপারে বলেন, যারা জিহাদ কায়েম করে এবং শরিয়তের বিধি-বিধানও বাস্তবায়ন করে। তবে অন্য ক্ষেত্রে কিছুটা স্বেচ্ছাচার করে। যেমন তাদের একজন আছে, যাকে কিছু বিষয়ে স্বেচ্ছাচার করতে না দিলে, সে শরিয়তের বিধান বাস্তবায়ন করবে না, জনগনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না, শত্রুর মোকাবিলায় জিহাদেও প্রস্তুত হবে না। তাদেরকেও ভাল কাজের আদেশ দিতে হবে এবং তার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যদিও এ সব বিষয়ে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা নিশ্চিত থাকে কিংবা তাদের স্বেচ্ছাচারিতা হয় হারাম ও অবৈধ ক্ষেত্রে। যেমন কিছু সম্পদ নিজের জন্য বাছাই করা, মানুষের ওপর অতিরিক্ত প্রভাব খাটানো, গনিমতের মাল নিজ ইচ্ছায় বণ্টন করা ইত্যাদি। তবে এটা ঠিক যে, এ সব স্বেচ্ছাচারিতার জন্য তাদের কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।"[৮]

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, "এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, বাজার যখন হারাম বা সন্দেহযুক্ত জিনিসে এমনভাবে সয়লাব হয়ে যায় যে, হালাল বস্তু পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন তুলনামূলক ভাল জিনিস গ্রহণ করা যাবে।" আরো বলা হয়, কতক খারাপ কতক খারাপের তুলনায় ভাল ও সহনীয়। যেমন বড় বেদআতে লিপ্ত ব্যক্তি যদি বড় বেদআত ছেড়ে ছোট বেদআতে লিপ্ত হয়, এটা তার জন্য ভাল।

gbl¨ ¯fve

বাস্তবতা বলতে আমরা যা বুঝাই, তা হচ্ছে সঠিক পন্থার কাছাকাছি বা তার কাছের কিছু। আমরা প্রতিটি বস্তু পুরোপুরি বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন দেখি না যে, সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন না করতে পারলে বসে থাকব, কোন চেষ্টা-তদবির কিছুই করব না। যদি আমাদের বোধ এরূপ হয়ে থাকে, তবে জ্ঞান করতে হবে, আমরা বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে আমরা ময়দান থেকে ছিটকে পড়ব, উদ্যম-আগ্রহ হারিয়ে ফেলব এবং উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপনে বাধ্য হব। অথবা আমরা নিজদের সামর্থ্যবান জ্ঞান করে, বাস্তবতা যদিও তার বিপরীত, এমন অভিযানে নেমে যাব, যেখানে নিজদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হবে না।

---

[৬] ইমাম নববির মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ : ১৭/২৬২

[৭] মুসনাদে ইমাম আহমদ : ১/৩৮০

[৮] মাজমুউল ফতোয়া : ৩৫/২৮

ইসলাম এমন কোন জিনিস উপস্থাপন করেনি, যা মানুষের সাধ্যের বাইরে বা তার সুস্থ ও প্রকৃত স্বভাবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। খ্রিস্টীয় ধর্ম এক সময় বলত, "তোমরা নিজ দুশমনদের মহব্বত কর; যারা তোমাদের অভিসম্পাত করে, তাদের তোমরা মোবারকবাদ দাও; যারা তোমাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদের প্রতি তোমরা সদয় হও।" অথচ এ নীতিই হচ্ছে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মূল উপাদান। এর মাধ্যমে শক্তিশালী অপরাধীদের দুর্বল অত্যাচারিতদের মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। এ জন্যই আমরা লক্ষ্য করি যে, যারা নিজদের খ্রিস্টান বলে পরিচয় দেয়, তারাই এ নীতির সব চেয়ে বেশি বিরুদ্ধাচরণ করে। মানুষের স্বভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ কোন ধর্মেই এ ধরনের নীতি গৃহীত হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে : "আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।"[৯] মূলত কোরআন ইনসাফ, অনুগ্রহ ও স্বার্থের মাঝে যথাযথ সমন্বয় সাধন করেছে। এরশাদ হচ্ছে : "আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোশ নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদের পছন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং জমিনে অন্যায়ভাবে সীমা লঙ্ঘন করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর যে ধৈর্যধারণ করে আর ক্ষমা করে, তা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[১০]

আবার যারা 'অহিংসা নীতি' প্রচার করে তারাও কল্যাণকর কোন আদর্শ উপহার দিচ্ছে না। এটাও একটা সাধারণ বুলি, যা ধারণা ও অলীক ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল। হিন্দুস্থানের মহাত্মা গান্ধী এ চিন্তার উদ্ভাবক।

বিকৃত ইঞ্জিলেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কোরআন অনিষ্ট ও জুলুমের বিপরীতে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এরশাদ হচ্ছে : "আর যাদের ওপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হলে, তারা তার প্রতিবিধান করে।"[১১] ইসলাম যুলম ও নির্যাতনের নিকট আত্মসমর্পণ করার বিপরীতে লড়াইয়ের বিধান দিয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম।"[১২]

মানুষ নিজ প্রশংসা পছন্দ করে। যদি এ প্রশংসার কারণে সে অহংকার বা দম্ভে লিপ্ত না হয়, তবে ইসলাম প্রশংসা করাকে নিষেধ করে না। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে : "আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।"[১৩] আমরা ইবরাহিম আ.-কে দেখি, তিনি বলেছেন : "এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন।"[১৪] প্রথম আয়াতের মধ্যে সৎ ও নেককার তথা মুত্তাকিদের অনুসরণীয় ইমাম ও নেতা বানিয়ে দেয়ার দোয়া করা হয়েছে।

মানুষ ভাল কাজ আঞ্জাম দেয়, ফলশ্রুতিতে আমরা তার প্রশংসা করি, যা শুনে সে আনন্দিত হয়। এটা রিয়া বা লোক দেখানো আমল গণ্য হবে না। এটা মনুষ্য তবিয়ত বা স্বভাব। হাদিসে এসেছে, রাসূল সা. সাহাবাদের ভরা মজলিসে একটি মোবারক গাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের অন্তরে যার সঠিক উত্তর উদয় হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা ভরা মজলিসে ব্যক্ত করেননি। পিতা ওমর এ কথা শুনে বলেন, সে মজলিসে তোমার এর উত্তর দেয়াটা আমার নিকট অনেক অনেক সম্পদ থেকেও পছন্দনীয় ছিল।

আল্লাহ তাআলার বাণী "তোমরা তার ফল থেকে আহার কর, যখন তা ফল দান করে এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও।" এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমরা প্রথমে খাও, অতপর তার হক দান কর।

মানুষ সামাজিক সংস্থা বা রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পছন্দ করে। এ জন্য ইসলাম বংশ বা গোত্র প্রথা বাতিল ঘোষণা করেনি। যেমনটি অনেকের ধারণা। হ্যাঁ, পক্ষপাত ও স্বজনপ্রীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কবিলা বা বংশকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দান করেছে। এর মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সাথে পরিচিত হয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক গভীর হয় ও বৃদ্ধি পায়। তবে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে

[৯] আল-বাকারা : ২৮৬
[১০] আশ্-শুরা : ৪০-৪৩
[১১] আশ্-শুরা : ৩৯
[১২] হজ্জ : ৩৯
[১৩] আল-ফুরকান : ৭৪
[১৪] আশ-শুআরা : ৮৪

‘তাকওয়া’। আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।”[১৫]

`vIqv‡Zi †¶‡Î evˉeZv

পরিকল্পিত ও সুনিশ্চিত ধাপে ধাপে মুসলমানদের মান ও অবস্থান উন্নত করাই হচ্ছে সব চেয়ে নিরাপদ ও কার্যকরী পদক্ষেপ। এ প্রক্রিয়ার ফলে মুসলমান উন্নীত স্তরে মজবুত ও দৃঢ়চেতা থাকবে এবং সামনের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য আরো উদ্যমী হবে। একটি প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি সবেমাত্র ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, তার ব্যাপারে এখন আমাদের করণীয় কি? মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয়সহ এক সাথে সমগ্র ইসলাম তার সামনে পেশ করব? না, প্রথমে তার সামনে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো উপস্থাপন করব, যাতে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম তার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। অতপর আস্তে আস্তে আনুষঙ্গিক ও ইসলামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরব? তাকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও মজবুত রাখার জন্য কোনটি সবচেয়ে কার্যকর ও যথোপযুক্ত পদ্ধতি? আরেকটি প্রশ্ন : কোন একটি দেশ বা ভূ-খণ্ড, যা শতাব্দী ধরে কুফর ও মানব রচিত শাসনে পরিচালিত হচ্ছে, অন্ধকারে রয়েছে ইসলামের যৌক্তিক বিধান ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আদর্শ থেকে, তা যদি মুসলমানদের অধীনে চলে আসে, প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে মুসলমানদের কর্তৃত্ব, সে ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? প্রথম ধাপে ও একসঙ্গে সবার ওপর সমগ্র ইসলাম চাপিয়ে দেব; না, প্রথমে ইসলামের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জারি করব, যেমন ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও রুকনসমূহ, শরিয়তের আরেকটি মূল লক্ষ্য যথা মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। অতপর ধাপে ধাপে ইলমে দীন শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষা করার ব্যবস্থা করব এবং নতুন রাষ্ট্রের রক্ষণা-বেক্ষণ ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য বিধান রচনা করব? কোনটি যৌক্তিক ও ফলপ্রসূ, প্রথম প্রস্তাব না দ্বিতীয় প্রস্তাব? আরো একটি প্রশ্ন : যদি কোন মুসলমানকে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও ধর্ম প্রচারের সুযোগ দেয়া হয়, সে কি এ প্রস্তাব গ্রহণ করবে?-এ অর্থে যে সীমিত পরিসরে হলেও ইসলাম কায়েম করার সুযোগ পেয়েছি; না প্রত্যাখ্যান করবে?-এ বলে যে, সমগ্র ইসলাম যেহেতু কায়েম করা যাচ্ছে না, তাই এ সামান্য সুযোগ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কোন প্রস্তাব বিজ্ঞোচিত? অবশ্যই প্রথমটি।

শায়খ রশিদ রেজা বলেন : “এমন স্বাধীনতা, যেখানে কতক নিষিদ্ধ কাজের বৈধতা রয়েছে, তবে কোন ভাল কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা নেই, সে দাসত্ব থেকে উত্তম, যেখানে ভাল কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, আর মন্দ কাজের জন্য রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। কারণ, দাসত্ব মানুষের অন্তর থেকে মজ্জাগত ব্যুৎপত্তি বিলুপ্ত করে দেয়, বাধাগ্রস্ত করে তার প্রকৃতিগত বিকাশকে। পক্ষান্তরে স্বাধীনতা মানুষের সামর্থ্যের সবটুকু বিকাশের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশ উপহার দেয়।”[১৬]

j¶¨ I j‡¶¨ †cŠQvi Dcvq

যে লক্ষ্যের যে বিধান, তার উপায়েরও সে বিধান। লক্ষ্য যতটুকু গুরুত্ব বহন করে, তার উপায়ও ততটুকু গুরুত্ব বহন করে। এটাই সর্ব সম্মত বিধি ও নীতিমালা এবং সবার নিকট সমানভাবে গ্রহণীয় বিধান। যে উপায়ের মাধ্যমে ওয়াজিব সম্পাদন করা হয়, সে উপায় গ্রহণ করাও ওয়াজিব। যে উপায়ের মাধ্যমে অবৈধ কর্ম সংগঠিত হয়, সে উপায় গ্রহণ করাও অবৈধ। বৈধ লক্ষ্যের জন্য অবৈধ উপায় গ্রহণ করা যাবে না। এটাই হচ্ছে মূলনীতি। এ নীতির বাইরে কিছু নেই। এমন কোনও বৈধ লক্ষ্য নেই, যার জন্য অবৈধ উপায় সিদ্ধ।

‘লক্ষ্য যে কোন উপায়কে বৈধতা দেয়’ এ বাক্যটি আমাদের সামনে বিরাট জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছে। এটি একটি পরিত্যাজ্য নীতি। ইতালিয়ান রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ‘ম্যাকিয়াভিলী’ তার লিখিত ‘দি লিডারস’ নামক গ্রন্থে এ নীতির প্রতিই আহ্বান জানিয়েছেন। রাষ্ট্রকে মজবুত ও পাকাপোক্ত করার নিমিত্তে সব ধরনের উপায় গ্রহণ করা সিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যে কারণে মানুষ এ বাণীকে তার স্লোগান হিসেবে গণ্য করে এবং সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দর্শনকে ম্যাকিয়াভিলী দর্শন বলে, কেউ কেউ এটাকে পৈশাচিক রাজনৈতিক দর্শন বলেও আখ্যায়িত করেছে। ম্যাকিয়াভিলী তার অনুগতদের সেসব শাসকদের থেকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, যারা সত্যবাদী ও দয়াপরবশ। আর যেসব শাসক প্রতারণা ও কঠোর নীতির মাধ্যমে নিজ শাসন ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছে, প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় লাভ করেছে ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে সক্ষম হয়েছে, তাদের তিনি প্রশংসা করেছেন। অতপর তিনি বলেছেন, ‘লক্ষ্য সব ধরনের উপায়কে বৈধতা দান করে।’

[১৫] আল-হুজুরাত : ১৩

[১৬] মাজাল্লাতুল মানার : বর্ষ ৬ : সংখ্যা ৬

অনেক ইসলামি কলামিস্টদের সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে, এ নীতির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা ও একে অস্বীকার করা। কারণ, ইসলাম তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য একমাত্র শালীন ও ভদ্রোচিত উপায়কেই বৈধতা দান করে। হ্যা, নীতিগত দিক থেকে এ অবস্থান ঠিক আছে। তবে একে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা ও এর কোন অংশে আমল না করার ফলে অনেক বৈধ ও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইসলামি কর্মতৎপরতার মধ্যে এক ধরনের স্থবিরতা আসারও রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। ম্যাকিয়াভিলী ও তার অনুসারীদের লক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়া অর্জন করা ও শাসকের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। পক্ষান্তরে মুসলমানদের লক্ষ্য হচ্ছে এর বিপরীত, তথা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করা। ইসলামি শরিয়তেও জরুরতের ভিত্তিতে কতক অবৈধ উপায়কে বৈধতার বিধান দিয়েছে। লক্ষ্য যেহেতু বৈধ, তাই উপায়কেও বৈধতার হুকুম প্রদান করেছে। তবে একেবারে নিঃশর্ত ছেড়ে দেয়নি, এর জন্য রয়েছে কিছু বিধান ও নিয়ম।

বনি নজিরের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধের ব্যাপারে সূরায়ে হাশরে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা যেসব নতুন খেজুর গাছ কেটে ফেলছ অথবা সেগুলোকে তাদের মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ। তা তো ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং যাতে তিনি ফাসেকদের লাঞ্ছিত করতে পারেন।"[১৭] অর্থাৎ বনি নাজিরের খেজুর বাগান কাটার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন, যাতে শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মুসলমানদের অংশেই প্রত্যাবর্তন করবে, যা মূলত আল্লাহর অনুগ্রহ। ইবনে আশুর রহ. বলেন, এ আয়াতের ওপর ভিত্তি করে ফিকাহবিদগণ বলেছেন, "শত্রুপক্ষের বাড়িঘর ধ্বংস করা ও তাদের গাছপালার ক্ষতিসাধন করার মধ্যে যদি কোন হিকমত ও ইসলামি স্বার্থ বিদ্যমান থাকে, তবে তা করা যাবে, যদিও ধ্বংসাত্মক কর্মের অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করা, তবুও শত্রুপক্ষের মোনবল ভেঙে দেয়া ও তাদের আতঙ্কিত করার জন্য ইসলামে তার বৈধতা রয়েছে।

কোনো কোনো সময় মিথ্যা বলাও বৈধ, বরং মিথ্যা বলা ওয়াজিব হয়ে যায়। শায়খ ইজ ইবনে আব্দুসসালাম বলেছেন, "যদি এমন হয়, নির্দোষ কোন ব্যক্তি কারো নিকট আত্মগোপন করে আছে, অন্য কোন ব্যক্তি তাকে হত্যা করতে চায়, তবে ওই ব্যক্তির জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজিব, কোনভাবেই সে তার সন্ধান দেবে না। অথবা কারো নিকট আমানত রয়েছে, কোন দুরাচার ব্যক্তি ওই আমানত নেয়ার জন্য সন্ধান চাইলে, তাকে সন্ধান না দেয়া ওয়াজিব। যেহেতু আমানত হেফাজত করাও ওয়াজিব। সিরাতের গ্রন্থে আছে, সাহাবি হাজ্জাজ বিন আলাত রাসূল সা. এর নিকট নিজ স্ত্রী ও গোত্রের কাছে এ মর্মে মিথ্যা বলার অনুমতি চেয়েছেন যে, তিনি ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করেন, যাতে তিনি মক্কা থেকে মাল-সামান নিয়ে নিরাপদে বের হয়ে যেতে পারেন, রাসূল সা.ও তাকে সে অনুমতি দিয়েছেন। ইবনুল কায়্যিম রহ. এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, অন্যের ক্ষতি ব্যতীত নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, নিজের ব্যাপারে বা অন্যের ব্যাপারে মিথ্যা বলা জায়েজ। উক্ত সাহাবির মিথ্যার পিছনে একটি স্বার্থ ছিল, যা মিথ্যা বলার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।"[১৮]

কোন ব্যক্তি স্বীয় নিশ্চিত হক যদি ঘুষ ব্যতীত উশুল করতে সক্ষম না হয়, তবে তার জন্য ঘুষ দেয়া বৈধ। তদ্রুপ কেউ যদি জুলুমের শিকার হয়, যা ঘুষ ব্যতীত দূর করা সম্ভব নয়, তার পক্ষেও ঘুষ দেয়া বৈধ। তবে, যে গ্রহণ করবে, সে সর্বদাই গুনাহ্গার হবে।

মালেকী ফকিহ ইমাম কুরাফি রহ. বলেছেন, "হারামের উপায় অনেক সময় বৈধ হয়ে যায়, যদি তার পিছনে সুনির্দিষ্ট কোন বৈধ লক্ষ্য থাকে। যেমন সম্পদের বিনিময়ে কাফেরদের থেকে মুসলমান বন্দিদের মুক্ত করা, তদ্রুপ সম্পদের বিনিময়ে ডাকাতদের থেকে নিজের জানকে হেফাজত করা ইত্যাদি।

যে সব ক্ষেত্রে হারাম বা অবৈধ উপায় গ্রহণ করা যাবে, সেখানে নিম্নের শর্তগুলো মেনে চলতে হবে :

১. বৈধ উপায় না থাকা।

২. শুধু প্রয়োজন মোতাবেক নিষিদ্ধ উপায় ব্যবহার করা।

৩. কারো ওপর জুলুম করার জন্য ব্যবহার না করা।

৪. যার জন্য হারাম উপায় ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ কম থাকা।

[১৭] আল-হাশর : ৫

[১৮] জাদুল মাআদ : ৩/৩৫০

eo Avkvi K_v

‘এটা প্রয়োজন, ওটা প্রয়োজন, এমন হওয়া উচিত ছিল, তেমন হওয়া উচিত ছিল ।’ এ ধরনের কিছু উক্তি প্রচলিত রয়েছে । অথচ যা আমাদের সামনে ও সাধ্যের মধ্যে বিদ্যমান এবং হাতের নাগালে রয়েছে তা বাস্ত বায়ন করার কোন পদক্ষেপ নেই, তার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত একটি স্তরে উন্নীত হওয়ার পরিকল্পনা নেই, যেখান থেকে আরো উন্নত স্তর এবং অধিক ফললাভের জন্য সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে ।

তবে এসব উক্তিও সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাজ্য বা অবজ্ঞার জিনিস নয় । হ্যাঁ, মানুষের বাস্তব জীবন যাত্রার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে সর্ব ক্ষেত্রে এসব উক্তি করা প্রলাপ বৈ কিছু নয় । মানুষের ভেতর এক শ্রেণি আছে দুর্বল, আরেক শ্রেণি আছে কল্যাণের ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহী, আরেক শ্রেণি আছে যারা অপরাধ করে আবার অনুশোচনাও করে, তওবা করে । অতএব সবাইকে এক স্তরে উন্নীত হতে বলা যায় না, সবার পক্ষে তা সম্ভবও নয় ।

বর্তমান সমাজের কতক ইসলামপন্থী এ বাস্তবতা পরিহার করে খুব লম্ফঝম্প আরম্ভ করে দিয়েছে । অথচ তারা ইসলামি সমাজের রূপরেখা এবং বর্তমান সমাজের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তার সাথে চলার অভিজ্ঞতা শূন্য । এমনকি সেসব কারণের ব্যাপারেও অজ্ঞ, যার কারণে সমাজের বর্তমান দুরাবস্থা । অথচ ব্যক্তি ও সমাজ পরিবর্তনের নীতি ও বিধান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক । তারা এ বাস্তবতা থেকে সরে গিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছে । সেখান থেকেই তারা এমন লক্ষ্যের জন্য পরিকল্পনা করছে, যার সামনে রয়েছে পাহাড় সম বাধা; কিংবা তার জন্য এমন সংঘর্ষের মুখোমুখি হচ্ছে, যা ছিল ধারণারও বাইরে । কারণ, ইতোপূর্বে তারা কাল্পনিক জগৎ বা কেতাবি দুনিয়াতে বাস করেছে, যুগের চাহিদা অনুধাবন করেনি, গভীর দৃষ্টি দেয়নি দেশ, জাতি ও স্থান-কাল-পাত্রের ওপর । যার ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে ।

এ বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের হতোদ্যম বা তাদের চেতনাকে স্তিমিত করা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্ত বতাকে জানার জন্য আহ্বান করা এবং রাসূলের বাণী “তোমরা সঠিক পন্থা অবলম্বন কর এবং তার কাছাকাছি থাক ।” এর প্রতি দাওয়াত দেয়া । বাস্তবতা ও আমাদের বড় বড় আশার সাথে সমন্বয় করা । সবাইকে সালাম ।

mgvß